গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ২০ সংখ্যা | ৫ - ১১ জানুয়ারি ২০২৪ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

সিলেবাসে ইতিহাস বিকৃতির প্রতিবাদ ইতিহাস কংগ্রেসে

জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসরণে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে যে ভাবে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানো হচ্ছে, তার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের ৮২তম অধিবেশনে। সিলেবাসের এই সংশোধনের বিরুদ্ধে সেখানে প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছে। গৃহীত এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ডঃ তরুণকান্তি নস্কর ৩১ ডিসেম্বর এ প্রসঙ্গে এক বিবৃতিতে বলেন,

তেলেঙ্গানা রাজ্যের ওয়ারাঙ্গলে কাকাতিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২৮-৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের ৮২তম অধিবেশনে 'জাতীয় শিক্ষানীতির অবকাঠামোয় ইতিহাস' শীর্ষক প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপে 'আমাদের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ইতিহাসের একটি অতিরঞ্জিত ও বেঠিক দৃষ্টি' উপস্থাপনা করা, 'ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম'— যা কিনা 'জাতপাত জর্জরিত উদাহরণ সহ প্রাচীনকালের রচনায় পরিপূর্ণ'— তাকে অবশ্যপাঠ্য করা, তৎসহ আর্যজাতির ইতিহাসকে অদ্ভুত কায়দায় ভুলভাবে তুলে ধরা, মুঘল সম্রাট আকবরকে ভারতের বিস্তৃত ইতিহাসের সিলেবাস থেকে বাদ দেওয়া প্রভৃতির তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। এই পদক্ষেপগুলি সবই জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র সুরে মেলানো।

তিনি বলেন, ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের এই প্রস্তাবকে আমরা আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। এই ইতিহাস কংগ্রেসে জেএনইউ-এর আদিত্য মুখার্জী, এএমইউ-এর আলি নাদিম রিজভি, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর মহালক্ষ্মী প্রমুখের মতো প্রথম সারির ইতিহাসবিদরা উপস্থিত ছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দাবি করছি, ইউজিসি, এনসিইআরটি, কেন্দ্রীয় সরকার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষ ইতিহাস বিশেষজ্ঞদের এই মূল্যবান মতামতকে গুরুত্ব দিন এবং এখনও পর্যন্ত ইতিহাসের সিলেবাসে যে সব 'সংশোধন' করা হয়েছে তা প্রত্যাহার করুন।

৫ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতি! রামা কৈবর্ত-রহিম শেখের কী এল-গেল

প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর দলবল দেশ জুড়ে প্রচার চালাচ্ছেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে তাঁরা 'উন্নত' দেশে পরিণত করে দেবেন। আপাতত ২০২৫ সালের মধ্যেই দেশকে পৌঁছে দেবেন ৫ ট্রিলিয়ন (লক্ষ কোটি) ডলারের অর্থনীতিতে।

দেশ যদি 'উন্নত' হয়, দেশের অর্থনীতি যদি দ্রুত হারে শক্তিবৃদ্ধি করতে থাকে তবে দেশবাসী হিসাবে সকলেরই ভাল লাগার কথা। কারণ, দেশের উন্নতি মানে তো দেশের মানুষের উন্নতি— তাদের ভাল থাকা, ভাল খাওয়া-পরা, শিক্ষা-চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধি, বেকারদের কর্মসংস্থান।

প্রশ্ন হল, অর্থনীতির বৃদ্ধির সঙ্গে দেশের সাধারণ মানুষের আর্থিক উন্নতির আদৌ কি কোনও সম্পর্ক আছে? এক কথায় বললে— না, নেই। তা হলে প্রধানমন্ত্রী আর্থিক বৃদ্ধির কথা এত গর্ব করে বলছেন কেন?

সেই উত্তর খোঁজার আগে দেখে নেওয়া যাক আর্থিক বৃদ্ধি বলতে কী বোঝায়। একটি নির্দিষ্ট বছরে দেশের সামগ্রিক পণ্য ও পরিষেবা ক্ষেত্রের মোট উৎপাদনই হল দেশের আর্থিক উৎপাদন। এই উৎপাদন পূর্ববর্তী বছরের নিরিখে যে হারে বাড়ে তাকে সেই দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার বলে। দেশের এই মোট উৎপাদনকেই প্রধানমন্ত্রী ৫ লক্ষ কোটি ডলারে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেছেন। বর্তমানে অর্থনীতির আনুমানিক বহর ৩.৫ লক্ষ কোটি ডলার। '২৫ সালের মধ্যে অর্থনীতিকে ৫ লক্ষ কোটি ডলারে নিয়ে যাওয়া সম্ভব কি না, সেই বিতর্কে আমরা যাব না। যদিও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজনের মতো প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ বলেছেন, সেটা আদৌ সম্ভব নয়। কারণ তার জন্য বছরে বৃদ্ধির হার হওয়া দরকার কমপক্ষে ১৬ শতাংশ। বর্তমান বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বরে এই হার ছিল ৭.৮ শতাংশ। ফলে ব্যাপারটা যে অসম্ভব তা বলাই যায়। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখন থাক।

দুয়ের পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে চলছে স্বাক্ষর সংগ্রহ

পাটনা ও কলকাতা (বাঁদিক থেকে)

কাশ্মীরের জনগণকে কি সেনাবাহিনীর হাতেই ছেড়ে দিল বিজেপি সরকার

কাশ্মীরের মানুষের ভালমন্দের দায়িত্ব কার? সরকারের না সেনাবাহিনীর! কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ সম্প্রতি কাশ্মীরে গিয়ে যা বলে এসেছেন, তার মানে শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় এটাই যে, কেন্দ্রীয় সরকার কাশ্মীরের বড় অংশের মানুষের ভাগ্যকে ছেড়ে দিয়েছেন একদিকে সেনাবাহিনী, অন্য দিকে নানা গোষ্ঠীর সন্ত্রাসবাদীদের দ্বন্দ্বের মধ্যেই। তিনি পুঞ্চের টোপা মাস্তানদারার গ্রামে গিয়ে সেনাবাহিনীর অত্যাচারে নিহত নিরীহ তিন ভারতীয় নাগরিকের পরিবারকে সহানুভূতি জানাতে গিয়ে বলেছেন, সেনাবাহিনীর কাজ 'জাতিকে রক্ষা' করা এবং 'মানুষের মন জয় করা'। কাশ্মীর ছাড়া দেশের অন্যত্র যে কোনও বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে বিষয়টি অদ্ভুত শোনাবে, কারণ সেনাবাহিনীর কাজ বহিঃশত্রুর আক্রমণ মোকাবিলা করা। তাঁরা অবাক হবেন যে, প্রতিরক্ষামন্ত্রী কথিত এই দুটি কাজ কবে থেকে ভারত সরকার সেনাবাহিনীর হাতে ছেড়ে দিল! 'জাতি' বলতে মন্ত্রীমশাই কী বলতে চেয়েছেন, তিনিই জানেন। কিন্তু মানুষের মনের খবর রাখার কথা তো নির্বাচিত সরকারের! যদিও কাশ্মীরবাসী মাত্রই রাজনাথজির তত্ত্বকে হাড়ে হাড়ে বুঝবেন, যেমনটা তাঁরা বুঝে চলেছেন বছরের পর বছর ধরে।

২০১৯-এর ৫ আগস্ট কাশ্মীরের বিশেষ অধিকার সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপের পর থেকে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার জোরগলায় বলে চলেছে কাশ্মীরের মানুষের জীবন এখন নতুন খাতে বইছে। সন্ত্রাসবাদী হামলা, সরকারবিরোধী বিক্ষোভ এখন অতীত, শান্তির

দুয়ের পাতায় দেখুন

ভেতরের পাতায়

- মার্ক্সের চিন্তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এঙ্গেলস ঃ ভি আই লেনিন - পৃ. ৩
- বঞ্চনার শিকার বাংলাদেশের পোশাক শিল্প শ্রমিকরা- পৃ. ৫
- শহিদ কনকলতা শতবর্ষ উদযাপন - পৃ. ৭

রামা কৈবর্ত-রহিম শেখের কী এল-গেল

একের পাতার পর

ভারতের মতো একটি দেশে উৎপাদন হচ্ছে না, তা তো নয়। বরং কলে-কারখানায়, কৃষিতে, পরিষেবা ক্ষেত্রে কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষ তো উৎপাদন করে চলেছে। তাই উৎপাদন বৃদ্ধি নিয়ে কারও দ্বিমত থাকার কথা নয়। সেই উৎপাদন ৩.৫ লক্ষ কোটি থেকে ৪.৫ কিংবা ৫ লক্ষ কোটি ডলারে পরিণত হল, সেটাও বড় বিতর্কের বিষয় নয়। আসল কথা হল, কোটি কোটি মানুষ এই যে বিপুল পরিমাণে সম্পদ প্রতিদিন উৎপাদন করে চলেছে, তা যাচ্ছে কোথায়, তার ফল কে ভোগ করছে? শ্রমজীবী মানুষদের ভাগে তার কতটুকু পৌঁছচ্ছে? দেখা যাক সে হিসেবটা।

২০২৩ সালের অক্সফ্যাম রিপোর্ট বলছে, মাত্র ৫ শতাংশ নাগরিকের হাতে জমা হয়েছে দেশের মোট সম্পদের ৬০ শতাংশ। আর নিচের তলার ৫০ শতাংশ মানুষের জন্য জুটেছে তার মাত্র ৩ শতাংশ। এই হিসেবই বলছে, সরকারের রাজস্ব আয়ের বেশির ভাগটাই আসে যে জিএসটি থেকে তার ৬৪ শতাংশ আসছে সমাজের সবচেয়ে নিচের তলার ৫০ শতাংশ মানুষকে লুঠ করে। অথচ ওপরের তলার ১০ শতাংশ ধনী অংশ দেয় মাত্র ৩ শতাংশ জিএসটি। অক্সফ্যাম দেখাচ্ছে, ২০২০ থেকে '২২ সালের মধ্যে ভারতে শতকোটিপতির সংখ্যা ১০২ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬৬। শুধু এই হিসেব থেকেই স্পষ্ট, প্রধানমন্ত্রীর কথিত এই বিপুল ধনবৃদ্ধির সঙ্গে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের কোনও সম্পর্ক নেই। ধনবৃদ্ধি হয়েছে শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় ধনীরই। আর যারা দিবারাত্রি হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে এই বিপুল পরিমাণ উৎপাদন করে চলেছে, সরকারি রাজস্বের বেশির ভাগটাই জোগাচ্ছে, তারা কেমন আছে? তাদের বেশির ভাগেরই নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যায়। ঘরে আলো জ্বলে না, মাথার উপর ছাদ নেই, ছেলেমেয়ের লেখাপড়া হয় না, বাবা-মা-সন্তানদের চিকিৎসা হয় না। কারণ মালিকরা তাদের নিঃশেষে খাটিয়ে নিলেও উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেয় না। তাদের শ্রম চুরি করেই মালিক শ্রেণির এই সম্পদের পাহাড়। এই যে শোষণমূলক সমাজব্যবস্থা, যেখানে পুঁজিপতিরা অবাধে শ্রমজীবী মানুষের শ্রম লুঠ করতে পারে, রাজ্যে রাজ্যে এবং কেন্দ্রে থাকা সরকারগুলি সেই ব্যবস্থার পাহারাদার বলেই। ভারতীয় ধনকুবেররা যখন কেউ বিশ্বে পঞ্চম স্থানে, কেউ দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছে যাচ্ছে, সরকার তখন সভ্যতার আসল কারিগর একজন শ্রমিকের দৈনিক ন্যূনতম মজুরি ধার্য করেছে ১৭৮ টাকা। সেটুকু দিতেও বেশিরভাগ মালিক রাজি হয় না। তাই অর্থনীতির পরিমাণ যা-ই হোক, তাতে দেশের রামা কৈবর্ত-রহিম শেখের কিছুই যায়-আসে না।

বাস্তবে অর্থনীতির বৃদ্ধিই হোক, আর উন্নত দেশের তকমাই হোক, এ সবই মালিক শ্রেণি তথা শাসক শ্রেণির চোখ দিয়েই দেখা। কারণ, অন্য সব কিছুর মতোই উন্নয়ন বিচারের মাপকাঠিও দুটি— একটি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ শোষিত মানুষের জীবন-মানের সাপেক্ষে, আর একটি দেশের পুঁজিপতি-শিল্পপতি-ধনকুবেরদের পুঁজির আরও বৃদ্ধির সাপেক্ষে। যে হেতু সমাজটা শোষক ও শোষিত দুটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণিতে বিভক্ত, তাই উন্নয়নের মাপকাঠিও শ্রেণি নিরপেক্ষ ভাবে একটিই হতে পারে না। প্রধানমন্ত্রীর দলবল যে বৃদ্ধি আর উন্নয়নের দাবি করছেন তা আসলে এই দ্বিতীয় মাপকাঠিতেই মাপা।

বাস্তবে লোকসভা ভোটের আগে মোদি সরকারের সাফল্য তুলে ধরতেই দেশ জুড়ে একদিকে সরকার এবং অন্য দিকে বিজেপি ও আরএসএসের কর্মী বাহিনী এই উন্নয়নের স্বপ্ন ফেরি করতে নেমেছেন। কিন্তু তাতে কি কাজ হবে? এই দিয়ে তারা ভোলাতে চায় দেশের অন্নহীন, ক্ষুধার্ত, কর্মহীন, শিক্ষা-চিকিৎসাহীন বিরাট সংখ্যক দেশবাসীকে, ভোলাতে চায় তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা, ভোলাতে চায় প্রতি বছর ঋণের জালে জড়িয়ে আত্মহত্যা করা সহস্র কৃষকের পরিবারকে? কিন্তু এই দিয়ে কি সত্যিই তাদের ভোলানো যাবে? ভোলানো যে যাবে না তা বিজেপি নেতা-মন্ত্রীরাও ভালই বোঝেন। তাই তো রামমন্দির নির্মাণের দেশজোড়া প্রচার, হিন্দুত্বের জিগির তোলার মরিয়া চেষ্টা।

স্বাভাবিক ভাবেই যত দিন যাচ্ছে, দেশের বেশিরভাগ শ্রমজীবী মানুষের দারিদ্র, অনাহার, বেকারি বেড়েই চলেছে। সঙ্গে বাড়ছে মানুষের ক্ষোভ। আর সেই সব কিছুকে চাপা দিতেই সরকার তাদের নীতির সাফল্য বোঝাতে দেশের মানুষকে আর্থিক বৃদ্ধির, দেশের উন্নতির গল্প শোনাচ্ছে। অন্য দিকে তাদের লক্ষ্য, মানুষের এই ক্ষোভ যাতে বিক্ষোভের আকারে, আন্দোলনের আকারে, বিদ্রোহের আকারে ফেটে না পড়ে, তারা যাতে সংগঠিত হতে, সচেতন হতে না পারে। তার জন্যই ধর্মের জিগির, জাতপাতের জিগির, তার জন্যই মন্দির রাজনীতি, তার জন্যই ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানো। শ্রমজীবী মানুষ শত ভাগে বিভক্ত হয়ে থাকুক। মালিক শ্রেণিকে নয়, জাত-ধর্মের ভিত্তিতে অন্য শ্রমিককে শত্রু ভেবে যেন তারা পরস্পর লড়াই করে। তা হলেই মালিকরা নিশ্চিন্ত। দেশের শিক্ষিত ছাত্র-যুব সমাজ যাতে প্রশ্ন না করে, সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে আঙুল না তোলে তেমন করেই তাদের সিলেবাস তৈরি কর, ইতিহাসকে বিকৃত করে দাও, সমাজবিকাশের বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলিকে ছাত্রদের জানতে দিও না। চন্দ্র অভিযানের সাফল্যকে শাসকের সাফল্য হিসাবে দেখাও, কিন্তু তার পিছনের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুশৃঙ্খল দিকটি তাদের জানতে দিও না। একদিকে রামমন্দির নির্মাণ, গোমাতার পুজো, ইতিহাসের বিকৃতি, মানুষের ভাবনাকে পিছন দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা, অন্য দিকে দেশকে ৫ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতিতে পৌঁছে দেওয়ার স্বপ্ন দেখানো— বিজ্ঞানের কারিগরি দিক, অর্থনীতির সাফল্য আর আধ্যাত্মিক চিন্তার সংমিশ্রণ, এই তো ফ্যাসিবাদী শাসকের পরিপূর্ণ লক্ষণ। পুঁজিবাদ সব সময়ই তার আকণ্ঠ নিমগ্ন সঙ্কট থেকে রেহাই পেতে এই ফ্যাসিবাদেই শেষ আশ্রয় খোঁজে। পুঁজিপতি শ্রেণির সেবাদাস বিজেপি সরকারও তাই খুঁজছে। কিন্তু একই সঙ্গে শোষিত মানুষ, যাদের উপর পুঁজিপতি শ্রেণি সঙ্কটের সমস্ত বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে, তারা এই সঙ্কটের হাঁসফাঁস অবস্থা থেকে চিরতরে রেহাই পেতে যথার্থ মুক্তির পথ খুঁজে চলেছে। সেই পথ গেছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দিশায়। দেশে দেশে আজ তাই আবার সমাজতন্ত্রের স্লোগান তুলে পথে নামছে মুক্তিকামী শ্রমজীবী মানুষ।

কাশ্মীর ঃ জনগণকে কি সেনাবাহিনীর হাতেই ছেড়ে দিল বিজেপি সরকার

একের পাতার পর

বাতাস মৃদুমন্দ নয়, বইছে একেবারে ঝড়ের গতিতে। উন্নয়নের স্রোত একেবারে জোয়ারে পরিণত হয়েছে। অথচ ২১ ডিসেম্বর পুঞ্চের ডেরা কি গলি এবং বাফলিয়াজ এলাকার কাছে সন্ত্রাসবাদী হামলায় পাঁচজন সেনা জওয়ান নিহত হলেন। তার পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় সেনাবাহিনী টোপা মাস্তানদারা গ্রামের আট বাসিন্দাকে তুলে নিয়ে যায় জিজ্ঞাসাবাদের নাম করে। পরের দিন পুলিশের দেওয়া খবর অনুযায়ী গ্রামবাসীরা সেনা ক্যাম্পে গিয়ে তার মধ্যে তিন জনের মৃতদেহ উদ্ধার করেন। বাকি পাঁচজন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। এই হত্যাকে কেন্দ্র করে জনবিক্ষোভ সামাল দিতে নিহত এবং আহতদের পরিজনকে কিছু আর্থিক ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিয়ে এসেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। শোনা গেছে সেনাবাহিনীর এক ব্রিগেডিয়ার সহ তিনজন কর্মী সাসপেন্ড হয়েছেন। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের দায় এক'দুজন সেনাকর্মীর ওপরে চাপিয়েই কি সরকার হাত ধুয়ে ফেলতে পারে? কাশ্মীর এখন প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন, তাহলে এমন ঘটনার দায় প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রীরা নেবেন না কেন?

গ্রামবাসী যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁরা অত্যন্ত দরিদ্র পশুপালক গুজ্জর এবং বকরেওয়াল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ। ভেড়া, ছাগলের পালের খাদ্য জোগাড়ের কারণে তাঁরা নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান। তাঁদের সাথে সন্ত্রাসবাদীদের যোগাযোগের কথা সরকার কিংবা সেনাবাহিনী কোনও দিনই বলতে পারেনি। বরং ১৯৯০ থেকে বহু বছর ধরে নানা ঘটনায় এই গোষ্ঠীর মানুষ তাঁদের চলাচলের বনাঞ্চল, তৃণভূমি কিংবা গ্রামে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর যাতায়াতের বিরোধিতা করার ফলে তাদের রোষের সামনে পড়েছে। অন্যদিকে সেনাবাহিনীর জুলুমও তাদের সইতে হয়েছে।

এছাড়াও বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে জম্মু এলাকায় উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা এই গোষ্ঠীর মানুষকে বহিরাগত, দখলদার বলে চিহ্নিত করে একাধিকবার আক্রমণ করেছে। ২০১৮-তে জম্মুর কাঠুয়ায় এই সম্প্রদায়ের ৮ বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ করে হত্যা করার ঘটনা ঘটলে বিজেপির নেতারা এমনকি এক মন্ত্রীও ধর্ষকদের সমর্থন জানিয়ে মিছিল করেছিলেন। কাশ্মীরের মানুষ জানেন, বিজেপি মদতপুষ্ট সংগঠনগুলি ও সরকারের ভূমিকাই গুজ্জর-বকরেওয়াল সম্প্রদায়ের মানুষকে সরকার ও সেনার প্রতি বিরূপ করে তুলেছে।

৩৭০ ধারা বিলোপের পর মন্ত্রীরা কাশ্মীরের অনেক উন্নয়নের গল্প ভারত জুড়ে শুনিয়েছেন। কিন্তু কাশ্মীরের অন্যান্য গরিব মানুষের মতো গুজ্জর-বকরেওয়াল গোষ্ঠীর মানুষের জীবন এতটুকু বদলায়নি। সে রাজ্যের জনগণের শিক্ষা, চাকরি, হাসপাতাল, বিদ্যুৎ কোনও কিছুর অভাবই সরকার পূরণ করেনি। ৩১ ডিসেম্বর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকার কলকাতা সংস্করণ লিখেছে, পুঞ্চে সামান্য একটা খেলার মাঠ তৈরির আর্জিও সরকার না মানায় মানুষকে চাঁদা তুলে তার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে।

সম্প্রতি কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা সংক্রান্ত মামলাতে সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করেছে দীর্ঘকাল ধরে আইন শৃঙ্খলার বিষয় সেনাবাহিনীর হাতে ছেড়ে রাখা যায় না। যদিও সে রাজ্যে দীর্ঘকাল ধরে চালু আছে সশস্ত্র বাহিনীর হাতে বিশেষ ক্ষমতার আইন 'আফস্পা'। সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার অজুহাতে এই আইন অতীতে কংগ্রেস চালু করেছিল, এখন জনগণকে দমিয়ে রাখতে তা বিজেপি পরিচালিত সরকারের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। এর সাথে আছে সন্ত্রাসবাদ দমনের বিশেষ আইন ইউএপিএ, কাশ্মীরে সরকারের বিশেষ হাতিয়ার পাবলিক সেফটি অ্যাক্ট ইত্যাদি।

আফস্পার বলে সেনাবাহিনী কোনও মানুষকে যে কোনও সময় হত্যা পর্যন্ত করতে পারে। তার জন্য তাদের কোনও কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। এর ফলে মানুষের জীবনে পরিস্থিতি কী দাঁড়ায়, তার একটি উদাহরণই বোধহয় যথেষ্ট, ২০২০-তে শোপিয়ান জেলার আমসিপোরা গ্রামে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে তিনজন গুজ্জর যুবককে মিথ্যে এনকাউন্টারে গুলি করে মারে এক সেনা অফিসার। দীর্ঘ তদন্তের পর কোর্ট মার্শালে প্রমাণ হয় প্রমোশনের দিকে তাকিয়ে এই মিথ্যে এনকাউন্টার করা হয়েছিল। অফিসারের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। কিন্তু এই বছর নভেম্বরে আর্মড ফোর্সেস ট্রাইবুনাল ওই অফিসারের শাস্তি মকুব করে জামিন দিয়ে দিয়েছে। প্রসঙ্গত, দ্য ওয়্যার সরকারি তথ্য উদ্ধৃত করে দেখিয়েছে, পিরপঞ্জল এলাকায় যেখানে অতীতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের কথা কদাচিৎ শোনা যেত সেখানে শুধু ২০২৩-তেই ২৪ জন সরকার ঘোষিত সন্ত্রাসবাদী, ২১ জন সেনাকর্মী এবং ১০ জন সাধারণ মানুষ সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছেন। সারা কাশ্মীরে সংখ্যাটা সব মিলিয়ে প্রায় দুশো। কোন দিকে কাশ্মীরের পরিবর্তনের কথা বলছেন নরেন্দ্র মোদিজিরা! কাশ্মীরকে কাছে টানার দিকে, না আরও দূরে ঠেলে দেওয়ার পথে!

অকালবর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ, কৃষিঋণ ও বকেয়া বিদ্যুৎ বিল মকুবের দাবিতে কৃষি ও কৃষক বাঁচাও কমিটির ভাতার শাখার বিক্ষোভ মিছিল ও বিডিও ডেপুটেশন

রাষ্ট্র ও বিপ্লব (১১)

এ বছরটি বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ও রুশ বিপ্লবের রূপকার কমরেড লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ। এই উপলক্ষে দলের পক্ষ থেকে বর্ষব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসাবে ভি আই লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' রচনাটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। অনুবাদ সংক্রান্ত যে কোনও মতামত সাদরে গৃহীত হবে। এ বার একাদশ কিস্তি।

মার্ক্সের চিন্তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এঙ্গেলস

কমিউনের অভিজ্ঞতার তাৎপর্য প্রসঙ্গে মার্ক্স মৌলিক শিক্ষা তুলে ধরেছেন। এঙ্গেলস এই বিষয়ের আলোচনায় বারবার ফিরে এসেছেন, এ ব্যাপারে মার্ক্সের বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। কখনও কখনও এই প্রশ্নের অন্যান্য দিকের বিস্তৃত ব্যাখ্যাও তিনি এমন জোরালো ও স্পষ্ট ভাবে করেছেন যে, তাঁর ব্যাখ্যাকে আলাদাভাবে আলোচনা করা দরকার।

গৃহ সমস্যা

১৮৭২ সালে লেখা তাঁর 'দি হাউজিং কোয়েশ্চেন' গ্রন্থে এঙ্গেলস ইতিমধ্যেই কমিউনের অভিজ্ঞতাকে বিচার করেছিলেন এবং একাধিকবার রাষ্ট্র প্রসঙ্গে বিপ্লবের কর্তব্য কী হবে তা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। খুবই লক্ষণীয়, এই সুনির্দিষ্ট বিষয়ের আলোচনা একদিকে দেখিয়ে দিল, বর্তমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সাথে সর্বহারা রাষ্ট্রের মিল কোথায়, যা দুই রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। অন্য দিকে দেখাল, এদের মধ্যে পার্থক্য কোনখানে। আরও দেখাল রাষ্ট্রের ধ্বংসের পথে এই উত্তরণ হবে কী ভাবে।

"তা হলে, গৃহ সমস্যার সমাধান হবে কী ভাবে? বর্তমান সময়ে এর উত্তর দেওয়া হয় এইভাবে, অন্য সব সামাজিক সমস্যার সমাধান হয় যে ভাবে— ক্রমান্বয়ে চাহিদা ও যোগানের অর্থনৈতিক সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে। এ এমন একটা সমাধান, যা বারবার নতুন করে একই সমস্যার জন্ম দেয়। তাই এটা কোনও সমাধানই নয়। সামাজিক বিপ্লব এই প্রশ্নের সমাধান কী ভাবে করবে তা শুধু বিশেষ সমস্যার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে না। এই সমস্যা অনেক সুদূরপ্রসারী প্রশ্নের সাথে যুক্ত। এর অন্যতম মৌলিক প্রশ্নটি হল, শহর ও গ্রামের বিরোধাত্মক সম্পর্কের অবসান হবে কী ভাবে। ভবিষ্যত সমাজের জন্য একটা কাল্পনিক ব্যবস্থা রচনা করা আমাদের কাজ নয়। সে সম্পর্কে আলোচনা করা তাই সময় নষ্ট। কিন্তু একটা বিষয় নিশ্চিত, বড় বড় শহরে যথেষ্ট বাড়ি ইতিমধ্যেই আছে, যুক্তিসঙ্গত ভাবে তা ব্যবহার করলে এখনই ঘাটতি পূরণ করে গৃহ সমস্যার প্রকৃত সমাধান সম্ভব। এই কাজ সহজে তখনই করা যাবে, যদি বর্তমান মালিকদের কাছ থেকে বাড়িগুলো অধিগ্রহণ করে গৃহহীনদের এবং শ্রমিকরা যেখানে গাদাগাদি করে থাকে, সেই পুরনো ঘরগুলি থেকে তাদের এনে এই সব বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়। সর্বহারা শ্রেণি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার ঠিক পরেই জনগণের স্বার্থে এই সব কাজ করতে পারে। ঠিক যেমন বর্তমান বুর্জোয়া রাষ্ট্র জনগণের সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে সামরিক এবং অন্যান্য কাজে তা ব্যবহার করে।" (জার্মান সংস্করণ, ১৮৮৭, পৃষ্ঠা ২২)

রাষ্ট্রশক্তির রূপের নানা পরিবর্তনের কথা এখানে আমরা আলোচনা করছি না। আলোচনা

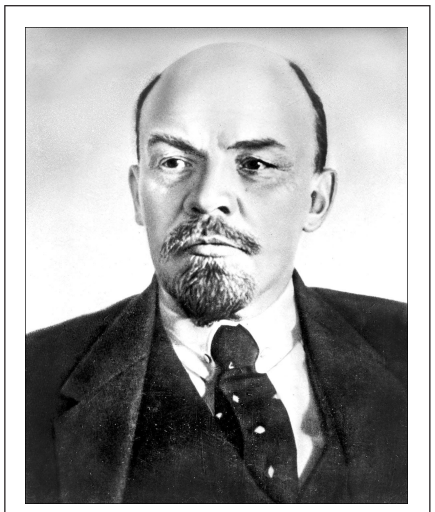

ভি আই লেনিন

করছি তার কাজের বিষয়বস্তু নিয়ে। বর্তমান রাষ্ট্রও হুকুম জারি করে সম্পত্তি দখল করে এবং তাকে সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহার করে। নিয়মতান্ত্রিক দৃষ্টিতে দেখতে গেলে, সর্বহারা রাষ্ট্রও ঘর বাড়ি দখল করার নির্দেশ দিতে পারে। কিন্তু এ কথা পরিষ্কার দেখা যায়, বুর্জোয়া ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত পুরনো প্রশাসনযন্ত্র অর্থাৎ আমলাতন্ত্র সর্বহারা রাষ্ট্রের আদেশ পালনে একেবারেই অনুপযুক্ত।

"যেটা বোঝা অবশ্যই দরকার, শ্রমিক শ্রেণির দ্বারা শ্রমের সমস্ত উপকরণকে এবং কারখানাগুলোকে 'যথার্থ অর্থে দখল করা', আর প্রুধোঁর 'ক্ষতিপূরণ' দেওয়া এই দুটো বিষয় একেবারে পরস্পরের বিপরীত। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শ্রমিক ব্যক্তিগতভাবে বাসস্থান, কৃষি ফার্ম, উৎপাদন উপকরণের মালিক হবে। আর প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে, 'শ্রমজীবী জনগণ' ঘরবাড়ি, কল-কারখানা এবং শ্রমের উপকরণের যৌথ মালিক হবে। আর অন্তত রূপান্তরের পর্যায়ে মূল্য উসুল না করে তা কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। ঠিক যেমন, জমির উপর ব্যক্তি মালিকানা লোপ পাওয়া মানেই ভূমি করের অবলুপ্তি নয়, বরং পরিশীলিত রূপে তা সমাজকে হস্তান্তরিত করা। তাই শ্রমের সমস্ত উপকরণ কার্যকরীভাবে শ্রমজীবী জনগণের দখলে আসা মানেই তা কর-সম্পর্ক বাতিল হওয়া বোঝায় না। (পৃষ্ঠা ৬৮)

এই অনুচ্ছেদে আমরা রাষ্ট্রের বিলোপের অর্থনৈতিক ভিত্তির কথা শুধু উল্লেখ করেছি। এই বিষয়টা আমরা পরের অধ্যায়ে আলোচনা করব। এঙ্গেলস খুব সতর্কভাবে বলেছেন, 'অন্ততপক্ষে রূপান্তরের পর্যায়ে' ভাড়া না নিয়ে সর্বহারা রাষ্ট্র প্রায় কাউকেই ঘর-বাড়ি ব্যবহার করতে দেবে না। যে সব ঘরবাড়ি সমগ্র জনগণের সম্পত্তি, তা ব্যক্তি পরিবারকে ব্যবহার করতে দিলে তা থেকে ঘর ভাড়া আদায় করতে হবে, তার উপর খানিকটা নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে এবং সেগুলি বণ্টনের একটা মাপকাঠিও ঠিক করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন একটা বিশেষ ধরনের রাষ্ট্র। কিন্তু তা অবশ্যই সেই বিশেষ সামরিক এবং আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রটা নয়, যেখানে উচ্চপদস্থ আমলারা বিশেষ সুবিধা ভোগ করে। বিনা ভাড়ায় বাসস্থান দেওয়ার মতো পরিস্থিতির দিকে রূপান্তর নির্ভর করে আছে রাষ্ট্রের 'সম্পূর্ণ বিলুপ্তির' ওপর।

কমিউনের পরবর্তীকালে তার অভিজ্ঞতায় প্রভাবিত ব্ল্যাঙ্কিপন্থীদের মার্ক্সবাদীতে রূপান্তরিত হওয়ার প্রশ্নে, বলতে গিয়ে এঙ্গেলস এই নিয়ম নীতির কথা বলেছেন—

"শ্রেণির অবলুপ্তি ও সাথে সাথে রাষ্ট্রের অবলুপ্তির জন্য উত্তরণের পর্যায়ে সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্ব ও তার রাজনৈতিক সংগ্রাম প্রয়োজন" (পৃষ্ঠা ৫৫)।

চুলচেরা সমালোচনার নেশায় যারা মত্ত বা 'মার্ক্সবাদের ধ্বংসকারী' বুর্জোয়ারা সম্ভবত এই কথার মধ্যে একটা স্ববিরোধ দেখতে পাবেন। তাঁদের মতে যেটা স্ববিরোধ— উপরে উদ্ধৃত অ্যান্টি ডুরিং থেকে এই অনুচ্ছেদে একদিকে 'রাষ্ট্রের অবলুপ্তির কথা' বলা হয়েছে, অন্য দিকে এই তত্ত্বকে নৈরাজ্যবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। অবাক হওয়ার কিছু নেই, যদি আমরা দেখি সুবিধাবাদীরা এঙ্গেলসকেও নৈরাজ্যবাদী বলে চিহ্নিত করে বসে আছেন। কারণ, জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রীদের (সোসাল শভিনিস্ট) এখন একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে যে, তারা আন্তর্জাতিকতাবাদীদের ক্রমাগত বেশি বেশি করে নৈরাজ্যবাদী বলে অভিযুক্ত করছেন।

মার্ক্সবাদ সব সময় শিখিয়েছে, শ্রেণি বিলোপের সাথে সাথে রাষ্ট্রও অবলুপ্ত হবে। অ্যান্টি ডুরিং-এর 'রাষ্ট্রের বিলুপ্তির' বহুখ্যাত অনুচ্ছেদে, রাষ্ট্র বিলোপের কথা বলার জন্য নৈরাজ্যবাদীদের অভিযুক্ত করা হয়নি। রাষ্ট্র 'রাতারাতি' ধ্বংস হবে, এই কথা বলার জন্য নৈরাজ্যবাদীদের বিরোধিতা করা হয়েছে।

এটা বাস্তব, বর্তমানের সোসাল ডেমোক্র্যাটরা রাষ্ট্র বিলোপের প্রশ্নে মার্ক্সবাদের সাথে নৈরাজ্যবাদের সম্পর্ককে পুরোপুরি বিকৃত ভাবে দেখাচ্ছেন। তাই নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মার্ক্স-এঙ্গেলস কী ধরনের বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন তা স্মরণ করা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

নৈরাজ্যবাদীদের সাথে বিতর্ক

এই বিতর্ক হয়েছিল ১৮৭৩ সালে। মার্ক্স ও এঙ্গেলস প্রুধোঁপন্থী, 'স্বায়ত্তশাসনবাদী' (অটোনমিস্ট) বা 'কর্তৃত্ব-বিরোধী'দের (অ্যান্টি অথরিটারিয়ান) বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই সব প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল ইতালির একটা সমাজতান্ত্রিক বার্ষিক পত্রিকায়। ১৯১৩ সালের আগে এই সব প্রবন্ধ জার্মান ভাষায় নিউ জেইত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি।

রাজনীতি পরিত্যাগ করার জন্য নৈরাজ্যবাদীদের ব্যঙ্গ করে মার্ক্স লিখেছেন, "শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক সংগ্রাম বিপ্লবী রূপ ধারণ করলে, তারা বুর্জোয়া একনায়কত্বের জায়গায় সর্বহারার বিপ্লবী একনায়কত্ব কায়েম করলে, তারা নীতি লঙ্ঘন করার মারাত্মক অপরাধে অভিযুক্ত হয়। কারণ, তাদের দৈনন্দিন স্থূল বাস্তব প্রয়োজন মেটানোর জন্য, বুর্জোয়াদের প্রতিরোধ চূর্ণ করার জন্য, তাদের রাষ্ট্রকে একটা বিপ্লবী ও উত্তরণকালীন রূপ দিতে হয়। অস্ত্র নামিয়ে রেখে, রাষ্ট্রকে অবলুপ্ত করার কর্মসূচি গ্রহণ করলে তাদের চলবে না" (নিউ জেইত, সংখ্যা ৩২,১, ১৯১৩- ১৪,পৃষ্ঠা ৪০)।

নৈরাজ্যবাদীদের চিন্তাকে খণ্ডন করতে গিয়ে মার্ক্স রাষ্ট্রের 'অবলুপ্তির' এই ধরনটার বিরোধিতা করেছিলেন! শ্রেণি না থাকলে রাষ্ট্রও থাকবে না, বা শ্রেণি অবলুপ্ত হলে রাষ্ট্রও অবলুপ্ত হবে। মার্ক্স আদৌ এই চিন্তার বিরোধিতা করেননি। শ্রমিক শ্রেণি অস্ত্র ব্যবহার করবে না, সংগঠিত সশস্ত্র বলপ্রয়োগ করবে না, অর্থাৎ, যে রাষ্ট্র বুর্জোয়াদের প্রতিরোধকে চূর্ণ করবে, সেই রাষ্ট্রকে ব্যবহার করবে না, মার্ক্স এই ধরনের তত্ত্বের বিরোধিতা করেছিলেন।

নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামকে যাতে কেউ বিকৃত করতে না পারে, এই জন্য মার্ক্স পরিকল্পনামাফিক সর্বহারা শ্রেণির যে রাষ্ট্র প্রয়োজন, সেই রাষ্ট্রের 'বিপ্লবী ও উত্তরণকালীন রূপের' উপর জোর দিয়েছিলেন। কিছু সময়ের জন্য সর্বহারা শ্রেণির রাষ্ট্র প্রয়োজন। লক্ষ্য হিসাবে রাষ্ট্রের অবলুপ্তির প্রশ্নে নৈরাজ্যবাদীদের সাথে আমাদের আদৌ কোনও মতপার্থক্য নেই। আমরা মনে করি, এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে, কিছু সময়ের জন্য আমাদের রাষ্ট্রকে ব্যবহার করতে হবে, শোষকদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রশক্তির সমস্ত উপকরণ, শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে। যেমন, শ্রেণি অবলুপ্তির জন্য শোষিত শ্রেণির একনায়কত্ব প্রয়োজন। এই একনায়কত্ব হবে সাময়িক। মার্ক্স নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায়, তীক্ষ্ণভাবে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। তিনি বলেছেন— পুঁজিবাদী জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার পর শ্রমিকরা কি তাঁদের 'অস্ত্র নামিয়ে রাখবে', নাকি পুঁজিপতিদের প্রতিরোধ চূর্ণ করার জন্য সেই অস্ত্র ব্যবহার করবে? কিন্তু, যদি উত্তরণকালীন রাষ্ট্র না থাকে তা হলে এক শ্রেণির বিরুদ্ধে অন্য শ্রেণি কেমন ভাবে সুপরিকল্পিত রূপে সেই অস্ত্র ব্যবহার করবে?

সমস্ত সোসাল ডেমোক্র্যাট নিজেদের প্রশ্ন করুক— নৈরাজ্যবাদীদের সাথে রাষ্ট্র সম্পর্কে বিতর্কে মার্ক্স কি বিষয়টিকে এই ভাবে আলোচনা করেছেন? দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অধিকাংশ নিয়মতান্ত্রিক সোসালিস্টপার্টিগুলো কি বিষয়টিকে এইভাবে দেখছে?

এই একই চিন্তা এঙ্গেলস আরও বিস্তৃত রূপে, আরও সহজভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সর্বপ্রথমে তিনি প্রুধোঁপন্থীদের ঘোলাটে চিন্তাকে ব্যঙ্গ করেছেন। এরা সব ধরনের কর্তৃত্ব, সব ধরনের অধীনতা, সব ধরনের শক্তিকেই অস্বীকার করে, নিজেদের সব ধরনের 'কর্তৃত্ববাদ বিরোধী' বলে অভিহিত করে। এঙ্গেলস বলেছিলেন, একটা কারখানা, একটা রেলওয়ে, গভীর সমুদ্রে একটা জাহাজের কথা ভাবুন। নানা ধরনের যন্ত্র ও অনেক মানুষের পরিকল্পিত সহযোগিতার ভিত্তিতে তৈরি এই জটিল যন্ত্রগুলোর একটাও নির্দিষ্ট ধরনের অধীনতা, নির্দিষ্ট

ছয়ের পাতায় দেখুন

লেনিন স্মরণে এআইইউটিইউসি-র উদ্যোগে শ্রমিক-সভা

শ্রমিক মুক্তি আন্দোলনের মহান শিক্ষক, রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপকার কমরেড লেনিন মৃত্যুশতবার্ষিকী উদযাপনের অঙ্গ হিসাবে

৩০ ডিসেম্বর কলকাতার থিওসফিক্যাল সোসাইটি হলে এআইইউটিইউসি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে 'শ্রমিকমুক্তি আন্দোলন ও লেনিন' শীর্ষক আলোচনা সভা হয়। শুরুতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস। রাজ্য সভাপতি কমরেড এ এল গুপ্তার সভাপতিত্বে এই সভায় উদ্যোক্তা সংগঠনটি ছাড়াও সিআইটিইউ নেতা কমরেড সোমনাথ ভট্টাচার্য, এআইটিইউসি নেতা কমরেড সুবীর মুখার্জী, এআইসিসিটিইউ-র নেতা কমরেড অতনু চক্রবর্তী, ইউটিইউসি-র নেতা কমরেড অশোক ঘোষ এবং টিইউসিসি নেতা দেবব্রত চক্রবর্তী বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা লেনিনের শিক্ষা অনুযায়ী ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত তাঁর বক্তব্যে লেনিনের শিক্ষা অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে অর্থনীতিবাদ থেকে মুক্ত রেখে শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণিচেতনা গড়ে তোলার উপরে জোর দেন। শুধু শ্রমিক শ্রেণির স্বতঃস্ফূর্ততার উপরে ভরসা নয়, যথার্থ বিপ্লবী দলের প্রয়োজনীয়তা এবং সমাজমুক্তি আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বদানকারী ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে মহান লেনিনের প্রজ্ঞাদীপ্ত অবদানের কথাও তিনি বলেন। বর্তমান সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে লেনিনবাদই হচ্ছে মার্কসবাদ— মহান স্ট্যালিনের এই বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়ন তিনি সবিস্তারে আলোচনা করেন। তিনি উপস্থিত সকলের প্রতি লেনিনের শিক্ষার ভিত্তিতে ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্যের নীতি অনুযায়ী ঐক্যবদ্ধও জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

তোলা আদায়ের প্রতিবাদ মোটরভ্যান চালকদের

শিল্পনগরী হাওড়ায় কারখানার কাঁচামাল ও পণ্য পরিবহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে মোটরভ্যান। কম খরচের সুবিধা থাকায় সাধারণ যাত্রী ও ছোট ব্যবসায়ীরাও মোটরভ্যান ব্যবহার করেন। জেলার প্রায় দশ হাজার মানুষ মোটরভ্যান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন।

কিন্তু জেলার কোনা হাইরোড, সলপ, সরস্বতী ব্রিজ, ধূলাগড়, বালি হল্ট প্রভৃতি জায়গায় এবং দাসনগর, ব্যাঁটরা, ডোমজুড় ও লিলুয়া থানার সামনে মোটরভ্যান চলাচলে বাধা দেওয়া হচ্ছে এবং চালকদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হচ্ছে। অনেক সময় হ্যান্ডেলও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।

তোলা আদায় বন্ধ ও অবাধে গাড়ি চালানোর দাবিতে ২৮ ডিসেম্বর সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের নেতৃত্বে হাওড়া জেলাশাসক ও ডিসি ট্রাফিকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান মোটরভ্যান চালকরা। তাঁদের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

নির্ভয়া দিবসে নারী নির্যাতন বন্ধের ডাক

২০১২ সালের ১৬ ডিসেম্বর দিল্লিতে এক প্যারামেডিকেল ছাত্রীর উপর ধর্ষণ ও অত্যাচারের

নৃশংস ঘটনা এবং ২৯ ডিসেম্বর তার মৃত্যু গোটা দেশে মানুষের ক্ষোভের বারুদে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। 'আর কোনও নির্ভয়া নয়'— এই দাবিতে দেশ জুড়ে মানুষ নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন।

আন্দোলনের চাপে নারী নির্যাতনবিরোধী নতুন আইন আনতে বাধ্য হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। তা সত্ত্বেও আজও গোটা দেশে প্রতি মুহূর্তে ঘটে চলেছে অসংখ্য নারীনির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনা। কিন্তু এর বিরুদ্ধে কার্যকরী ভূমিকা নেওয়া তো দূরের কথা, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপরাধীদের আড়াল করতেই দেখা যাচ্ছে শাসক দল ও তাঁবেদার প্রশাসনকে।

এই পরিস্থিতির প্রতিকারে ও 'নির্ভয়া' স্মরণে ২৯ ডিসেম্বর শিয়ালদা কোলে মার্কেটে নারী নিগ্রহবিরোধী নাগরিক কমিটির ডাকে প্রতিবাদ সভা হয়। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ফুটবলার ও কোচ অনিতা রায়, প্রাক্তন অধ্যাপক অনিল বিশ্বাস, ডাঃ দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী, ডাঃ অশোক সামন্ত, ডাঃ নুপুর ব্যানার্জী, অধ্যাপক তরুণ কান্তি নস্কর প্রমুখ। সভায় প্রতিবাদী গান, নাচ, আবৃত্তি প্রভৃতি পরিবেশিত হয়।

নারী নির্যাতন বন্ধের দাবিতে শিলিগুড়িতে মহিলা মিছিল

দার্জিলিং জেলা এআইএমএসএসের উদ্যোগে নারী নির্যাতন, খুন, নারী-শিশু পাচার, মূল্যবৃদ্ধি, মদ ও মাদক বন্ধ করা, জাতীয় ও রাজ্য শিক্ষানীতি বাতিল ইত্যাদি দাবিতে ২৬ ডিসেম্বর শিলিগুড়িতে একটি বিক্ষোভ মিছিল হয়।

মিছিল শেষে বাঘাযতীন পার্কের সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড মানসী রায়। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন সম্পাদিকা জয়ন্তী ভট্টাচার্য। সভায় সঙ্গীত ও আবৃত্তি পরিবেশিত হয়। সভা পরিচালনা করেন জেলা সম্পাদিকা শিখা নন্দী।

জেলায় জেলায় এআইডিএসও-র সভা

মালদা ঃ এআইডিএসও-র ৭০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে শিক্ষা সংস্কৃতি মনুষ্যত্ব রক্ষার আন্দোলনকে বেগবান করতে ২৩ ডিসেম্বর মালদা জেলায় অনুষ্ঠিত হল মতবিনিময় সভা। বর্তমান সময়ে শিক্ষা ও নৈতিকতার উপর আক্রমণ প্রসঙ্গে এই মতবিনিময় সভায় মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি কমরেড মনিশঙ্কর পট্টনায়ক।

সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি কমরেড বিশ্বরঞ্জন গিরি এবং রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড গৌরব ঘোষ।

মালদায় ছাত্রদের মতবিনিময় সভা

উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমান সময়ে শিক্ষা ও সামাজিক বিষয়ে সমস্যা প্রসঙ্গে তাদের মতামত রাখে এবং এই সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করার আন্দোলনে যোগদানের শপথ নেয়।

নদিয়া ঃ শিক্ষার প্রাণসত্তা ধ্বংসকারী জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ ও রাজ্য শিক্ষানীতি ২০২৩ বাতিলের দাবিতে, সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা ও মেহনতি মানুষের জীবন-জীবিকা রক্ষার সংগ্রামকে তীব্রতর করতে,প্যালেস্টাইন সহ দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী হানাদারির বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলবার অঙ্গীকারে ২৩ ডিসেম্বর নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার পক্ষে আয়োজন করা হয় ছাত্র সভা। সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড উৎপল দাস অধিকারী ও কমরেড সাবীর আলী এবং নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্ববৃন্দ।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে যুব বিক্ষোভ

এলাকার বেহাল রাস্তাঘাট সংস্কারের দাবিতে ও পানীয় জল সরবরাহে স্বজনপোষণের বিরুদ্ধে ২৭ ডিসেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন দিল যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও।

এ দিন শতাধিক মানুষের মিছিল গলা-ডহরা কালীমন্দির থেকে পঞ্চায়েতের উদ্দেশে রওনা হয়। এরপর প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে চলে পঞ্চায়েত ডেপুটেশন কর্মসূচি। পঞ্চায়েত প্রধান এআইডিওয়াইও-র দাবিগুলি যুক্তিসঙ্গত বলে স্বীকার করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন, আগামী কয়েক মাসে তিনি এলাকার সমস্ত সমস্যা খুঁটিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সঞ্জয় বিশ্বাস এবং সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুমন্ত গাঙ্গুলী।

বিশাল বিদ্যুৎ গ্রাহক সমাবেশ আসামে

অল আসাম ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (এএইসিএ)-র ডাকে আসামের জেলাগুলি থেকে আসা সহস্রাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহককে নিয়ে গুয়াহাটির লক্ষ্মীধর বরা মাঠে ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হল বিশাল গ্রাহক সমাবেশ। সমস্বরে দাবি উঠল— বিদ্যুতের মাশুল বাড়ানো চলবে না, স্মার্ট মিটার ও বিদ্যুতের বেসরকারিকরণ বন্ধ করতে হবে।

সমাবেশ পরিচালনা করেন বিদ্যুৎ আন্দোলনের নেতা অজিত আচার্য। উদ্বোধনী ভাষণ দেন আসাম বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি লিমিটেডের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার বিমল দাস। প্রধান বক্তা ছিলেন অল ইন্ডিয়া ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় কার্যকরী সভাপতি সমর সিংহ। সংগঠনের রাজ্য আহ্বায়ক ও জেলা নেতৃবৃন্দও বক্তব্য রাখেন। দাবিগুলির সমর্থনে গত তিন মাস ধরে রাজ্য জুড়ে যে গণস্বাক্ষর সংগৃহীত হয়েছে, এদিন সমাবেশ থেকে এক স্মারকলিপি সহ তা মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে জমা দেওয়া হয়।

গাজায় মরছে শিশুরা, ওদের বাঁচতে দাও

রাজপথে শিশু-কিশোরদের অবস্থান

উনিশে ডিসেম্বরের দুপুর। ঘড়ির কাঁটা তখন ১টা পেরিয়েছে। কলকাতার ব্যস্ত এসপ্ল্যানেড চত্বরের ওয়াই চ্যানেলে ভিড় করেছে অসংখ্য ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ও তাদের বাবা-মায়েরা। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের কিশোর সংগঠন কমসোমলের উদ্যোগে চলছে শিশু-কিশোর ও অভিভাবকদের যুদ্ধবিরোধী অবস্থান।

প্যালেস্টাইনের ওপর ইজরায়েলের আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছে দশ হাজারেরও বেশি শিশু। প্রতি দশ মিনিটে একজন করে শিশু এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছে প্রতিদিন। সমবয়সীদের এই অকালমৃত্যুর প্রতিবাদেই পথে নেমেছে এই স্কুলপড়ুয়ারা। কলকাতা সহ এসইউসিআই(সি) দলের চোদ্দটি সাংগঠনিক জেলা থেকে এসেছে তারা। পূর্ব মেদিনীপুর থেকে শতাধিক শিশু বাস ভাড়া করে এই জমায়েতে সামিল হয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সবাই শিয়ালদা থেকে মিছিল করে পৌঁছেছে ধর্মতলায়। পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগণা, হুগলি, হাওড়া— সব মিলিয়ে জমায়েত হাজার পেরিয়েছে। ওরা রঙ-তুলি-কালি নিয়ে শৈশবের কোমল চিন্তার ছোঁয়ায় কাগজে ফুটিয়ে তুলছে সৃষ্টির ছবি— যে ছবি বলছে ধ্বংস নয়, মৃত্যু নয়। কেউ লিখে এনেছিল হাতে লেখা যুদ্ধবিরোধী পোস্টার। সাংস্কৃতিক পরিবেশনায়, নাচ-গান-কবিতা-নাটকে বার বার ধ্বনিত হয়েছে ধ্বংসের বিরুদ্ধে সৃজনশীল সুর। শিশু-কিশোররাই সংগ্রহ করেছে যুদ্ধবিরোধী সাক্ষর। রাজপথে চক দিয়ে লিখে দিয়েছে যুদ্ধবিরোধী স্লোগান।

ভারতবর্ষ এই প্রথম সাক্ষী থাকল, যুদ্ধবিরোধী কর্মসূচিতে শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের। এই অবস্থানের গুরুত্ব এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন কমসোমলের রাজ্য ইনচার্জ সপ্তর্ষি রায়চৌধুরী। অবস্থানে সংহতি জানিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের ডাক্তাররা। তাঁদের পক্ষে ডাঃ দীপক গিরি অবস্থানে আগতদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। বর্ণনা করেন প্যালেস্টাইনে আক্রান্ত মানুষদের ভয়ঙ্কর অবস্থা, যুদ্ধের ভয়াবহতা। এস ইউ সি আই (সি) দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সান্টু গুপ্ত এবং কমরেড অনুরূপা দাস এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

দক্ষিণবঙ্গের মতো উত্তরবঙ্গেও এভাবেই শিশু-কিশোররা সামিল হয়েছিল প্রতিবাদী পথে। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের শহিদ মোড়ে যুদ্ধবিরোধী পোস্টার লিখে, যুদ্ধবিরোধী সঙ্গীত পরিবেশন করে তারা। শিলিগুড়িতেও ওই দিন অনুরূপ কর্মসূচি হয়। শিলিগুড়িতে যুদ্ধবিরোধী মানবতার গান ও কবিতার মাঝে যখন তাদেরই এক কর্মী মাইক্রোফোনে গাজার শিশুদের অবস্থা বলছিল, তখন দেখা গেল কিছু শিশুর চোখে জল। সেই চোখের জল রাস্তার ব্যস্ত মানুষকে থামিয়ে দিল তাদের অবস্থানের সামনে। ভাবালো তাঁদের। তাঁরাও জানালেন সহমর্মিতা।

জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, কোচবিহার ও বীরভূমে এই কর্মসূচি পালিত হয়। দু'হাজার শিশু এবং অভিভাবক যুদ্ধের বিরুদ্ধে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

সীমাহীন বঞ্চনার বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলনে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প শ্রমিকরা

বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম স্তম্ভ এই পোশাক শিল্প। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের ৮২ শতাংশই এসেছে পোশাক শিল্প থেকে। গত অর্থবর্ষে তৈরি পোশাক রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ৪২.৬১ বিলিয়ন ডলার। আগে মূলত আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ইউরোপের দেশগুলিতেই পোশাক রপ্তানি করত বাংলাদেশ। এখন বাজারের সীমানা সম্প্রসারণ ঘটেছে চিলি, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, মেক্সিকো, তুরস্ক সহ রাশিয়ার বাজার পর্যন্ত। অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হলেও এই শিল্পের শ্রমিকদের জীবনমানের অগ্রগতি ঘটেছে কতটুকু?

জীবনমান উন্নত হওয়ার প্রধান সূচক রোজগার, তা একেবারেই কম। শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মূল মজুরি মাসিক মাত্র ৬৩ ডলার (২০২০-তে আইএলও-র রিপোর্ট), বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে কম। এই নামমাত্র মজুরিতে জীবনের মানোন্নয়ন কি সম্ভব? তাই বাঁচার মতো মজুরির দাবিতে বারেবারেই বিক্ষোভ-আন্দোলনে ফেটে পড়তে দেখা যায় শ্রমিকদের।

অক্সফ্যামের ২০১৯-এর রিপোর্ট বলছে, প্রতি ১০ জন গার্মেন্টস শ্রমিকের মধ্যে ৯ জনই প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবার পান না। বিনা পুষ্টিতে হাড়ভাঙা খাটুনি, রোগগ্রস্ত দেহে কোনও রকমে কাজ করে চলাই শ্রমিকদের ভবিতব্য। কাজের পরিবেশ নেই, নেই কোনও রকম নিরাপত্তা। বছরের পর বছর ধরে কয়েক লক্ষ শ্রমিক কাজ করেন বাংলাদেশের নানা পোশাক কারখানায়। ঘিঞ্জি এলাকায় বহুতলে অন্ধকার পায়রার খোপের মতো ছোট ঘরে দিনরাত মুখ গুঁজে ঘন্টার পর ঘন্টা কাজ করেন শ্রমিকরা। এঁদের বেশিরভাগই মহিলা। প্রসূতিদের কাজ থেকে ছাঁটাই করে দেওয়া হয় নির্বিচারে। মালিকদের অবহেলায় বেশ কয়েক বছর ধরে কারখানা ধসে কিংবা আগুন লেগে শ্রমিকদের মৃত্যু স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। ২০১২ সালে পোশাক কারখানায় আগুনে পুড়ে ও দমবন্ধ হয়ে মারা যান শতাধিক শ্রমিক। তখন কিছুটা হইচই হলেও শ্রমিক-নিরাপত্তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কারখানা চালিয়ে যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। একচেটিয়া বড় বড় পোশাক শিল্পের মালিকরা বাড়তি মুনাফা করার জন্য শ্রমিকদের শ্রমকে পুরোপুরি নিংড়ে নেয়। সেজন্য মহিলা শ্রমিকরা শিশুসন্তান ছেড়ে দু'বেলা কাজ করেও পরিবার প্রতিপালনের জন্য ন্যূনতম রোজগার করতে পারছেন না। বিশ্বের অন্যান্য পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশের মতো চরম মালিকি শোষণে তাদের শ্রম আজ অধিক মুনাফার পণ্য।

শ্রমিকদের লাগাতার আন্দোলনের চাপে ২০১৮ সালে সরকার মজুরি বোর্ড গঠন করে গার্মেন্টস সেক্টরে নতুন মজুরি ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। তা কার্যকর হয় ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে। মৌলিক চাহিদা, ক্যালরির পরিমাণ, বাজারমূল্যকে বিবেচনায় রেখে শ্রমিকরা এবং আন্দোলনরত শ্রমিক সংগঠনগুলো গার্মেন্টস সহ সব সেক্টরে ন্যূনতম মজুরি ১৬ হাজার টাকা দাবি করেছিল। কিন্তু এই দাবিতে কান না দিয়ে মালিক মজুরি নির্ধারণ করে মাত্র ৮ হাজার টাকা, যা সুস্থ জীবনযাপনের নিরিখে অত্যন্ত কম। আওয়ামি লিগ সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকায় থেকেছে। অন্যদিকে বেতন-বৃদ্ধির অজুহাতে মালিকরা শ্রমিকদের কাজের চাপ বাড়িয়ে দেয়। শ্রমিক প্রতি উৎপাদন টার্গেট বাড়ানো হয় দ্বিগুণ-তিনগুণ। শ্রমিকদের মজুরি আগেকার ৫ হাজার ৩০০-এর বদলে ৮ হাজার টাকা হলেও বাড়ি ভাড়া, গাড়ি ভাড়া, গ্যাস, বিদ্যুৎ, জ্বালানি সহ সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়তে থাকায় শ্রমিকদের আর্থিক দুর্দশা রয়েই গেল।

বর্তমানে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে জীবনযাত্রার খরচ, শ্রমিক ও তার পরিবারের চাহিদা, উৎপাদনের খরচ, উৎপাদনশীলতা, পণ্যের দাম, নিয়োগকারীদের সক্ষমতা, দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা ও মুদ্রাস্ফীতি-মূল্যবৃদ্ধি সহ সবকিছু বিবেচনা করলে সর্বনিম্ন ২৫ হাজার টাকার কম হলে বেঁচে থাকা অসম্ভব। এই শিল্পে ক্রমাগত মুনাফা বৃদ্ধি সত্ত্বেও বাঁচার মতো মজুরি দিতে নারাজ মালিকরা। শ্রমিক হিসাবে প্রাপ্য অধিকার ও ২৫ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরির দাবিতে শ্রমিক আন্দোলনে আবারও উত্তাল হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। মিছিল, লাগাতার ধর্না, ধর্মঘটের পথে যেতে বাধ্য হয় তারা। যদিও শ্রমিকদের বুঝতে হবে, মজুরি বৃদ্ধির দাবি পূরণ হলেই তার জীবনের সমস্যার সমাধান হবে না। আর দক্ষতা বৃদ্ধি ও উৎপাদন বৃদ্ধি হলেও মালিকরা তাদের জীবনের সমস্যা মেটাবে না। কারণ পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের শ্রম বাবদ প্রাপ্য ন্যায্য মজুরি ফাঁকি দিয়ে অর্থাৎ তাদের শ্রম শোষণ করেই মুনাফার পাহাড় বাড়িয়ে চলে। ফলে এই ব্যবস্থার উচ্ছেদ ছাড়া শোষণের নাগপাশ থেকে শ্রমিকের মুক্তি সম্ভব নয়।

ভারতের কংগ্রেস-বিজেপির মতো বাংলাদেশের পূর্বতন বিএনপি কিংবা বর্তমানের আওয়ামি লিগ সরকার মালিকদের ম্যানেজার হিসাবে কাজ করে চলেছে, ফলে শ্রমিক স্বার্থ মার খাচ্ছে বছরের পর বছর। সরকারের মালিক তোষণ এতটাই যে, করোনা কালে শ্রমিকদের যখন চরম দুরবস্থা, তখন গার্মেন্টস মালিকরা মাত্র ২ শতাংশ সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে ৯ হাজার কোটি টাকা উপহার সহ নামমাত্র সুদে ৩০ হাজার কোটি টাকার শিল্প ঋণের সুবিধা পেয়েছে আওয়ামি লিগ সরকারের কাছ থেকে। এর সবটাই আসলে পাবলিক মানি। এ ছাড়াও সরকার মালিকদের স্বার্থে রপ্তানিতে উৎস-কর কমিয়ে ০.২৫ (নামমাত্র) করেছে। বিশ্বের অন্যান্য পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশের মতো এ দেশের পুঁজিপতি শ্রেণিকে তোষণ করে চলা সরকার কীভাবে শ্রমিকদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে মালিকদের তহবিল ভরাচ্ছে তার অন্যতম উদাহরণ পোশাক-শিল্প। ভারতে বিজেপি সরকার গত পাঁচ বছরে শিল্পপতিদের ১০.৫৭ লক্ষ কোটির ঋণ মুছেছে, সংসদের রিপোর্টে জানা গেছে। আর ৯ বছরে শিল্পপতিদের ১৪.৫ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ মুছে দিয়ে মকুব করেছে, তাদের উৎসাহ-ট্যাক্স জোগান দিচ্ছে বিজেপি সরকার, তেমনই বাংলাদেশের শিল্পপতিদের প্রতি দাক্ষিণ্য দেখাচ্ছে সে দেশের সরকার। বিএনপি বা আওয়ামি লিগ কোনও সরকার যে শ্রমিকদের স্বার্থ দেখবে না, তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন শ্রমিকরা। আন্দোলন ছাড়া সমস্যা সুরাহার আর কোনও পথ নেই বুঝে শ্রমিকরা জীবন বাজি রেখে আন্দোলনের রাস্তাতেই নেমেছেন।

পাঠকের মতামত

আসুন, দূষণ থেকে শিশুদের বাঁচাই

ইউনাইটেড আরব আমিরশাহী (ইউএই)-র দুবাইতে ইউএনএফসিসিসি-র ক্লাইমেট অফ পার্টিজ-এর (কপ ২৮, ২০২৩) ২৮তম কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। আমরা জানি যে, পৃথিবীর মূল জলবায়ু সংকটের জন্য দায়ী গ্রিন হাউস গ্যাস। এর জন্য একদিকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের আবরণ ওজন স্তর পাতলা হচ্ছে, অন্যদিকে ভূপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা মেরু প্রদেশের বরফ গলিয়ে দিচ্ছে। আর এই গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রায় ৮০ শতাংশ তৈরি হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানির (কয়লা, অশোধিত খনিজ তেল ও গ্যাস প্রভৃতি) দহন থেকে। এ ক্ষেত্রে বিশ্বের বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী ও শক্তিধর দেশগুলি (আমেরিকা, চিন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান, জার্মানি প্রভৃতি) প্রধানত দায়ী এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সহ অন্যান্য সমস্ত দেশই কম বেশি দায়ী। অথচ প্রতি বছরের মতো কপ-২৮ জলবায়ু সম্মেলনেও ওই সব দেশের প্রায় ২৫০০টি 'জীবাশ্ম জ্বালানি কোম্পানি' জলবায়ু রক্ষার নাম করে বিশ্ববাজারে নিজেদের তেল ও গ্যাস ব্যবসার পসার বৃদ্ধির নির্লজ্জ বিতণ্ডা চালিয়ে গেল। এবং অবশেষে বিশ্বের বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী ও শক্তিধর দেশগুলি জীবাশ্ম জ্বালানি সমূহের 'ফেজ আউট' স্লোগান বাতিল করে 'র‍্যাপিডলি ফেজ ডাউন আনঅ্যাবেটেড কোল টিল দ্য এন্ড অফ দিস সেঞ্চুরি'-কে জলবায়ু সামিটের খসড়া হিসেবে গ্রহণ করেছে।

অর্থাৎ, ওরা নিজেদের কাঁধ থেকে আগামী দিনে জলবায়ু রক্ষার দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে মোটামুটি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। কারণ পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি সরকারি ও বেসরকারি অর্থ জোগানে এবং গবেষণায় অনেক পিছিয়ে আছে। তাই এই দেশগুলি যদি সৎ ভাবে চেষ্টাও করে তাহলেও কার্যকরী ভাবে গ্রিন হাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। শুধু তাই নয়, এরপর সেই খসড়ায় বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী ও শক্তিধর দেশগুলি ঘোষণা করেছে যে, ধীরে ধীরে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ও উৎপাদন এমন ভাবে কমাতে হবে যাতে আগামী ২০৫০ পর্যন্ত কার্বন নির্গমন শূন্যে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় এবং পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে না যায় তা বজায় রাখা। অর্থাৎ বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী ও শক্তিধর দেশগুলি ২০৫০ পর্যন্ত খনিজ তেল ও গ্যাসের ব্যবসা যাতে নিশ্চিন্তে চালাতে পারে তার পাকাপোক্ত ব্যাবস্থা করা হল।

তবে আশার কথা, দেশে দেশে, এমনকি খোদ সম্মেলন প্রাঙ্গণে মুনাফালোভী সাম্রাজ্যবাদীদের এই নির্মম ও নির্লজ্জ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠেছে। প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ তেলের উৎপাদনের দখলের জন্য এই সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদসৃষ্ট নৃশংস যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং পৃথিবীর সার্বিক জলবায়ু রক্ষার দাবিতে আন্দোলন গড়ে উঠেছে।

এ ক্ষেত্রে সবার নজর কেড়েছে প্রবাসী ভারতীয় মণিপুরের কিশোরী লিসিপ্রিয়া কাংজাম। ১১ ডিসেম্বর সম্মেলনের অধিবেশনে পোস্টার হাতে মাত্র ১২ বছর বয়সী লিসিপ্রিয়া জলবায়ু রক্ষা কর্মী হিসেবে প্রতিবাদ জানায়। তার পোস্টার কেড়ে নেওয়া হয়। তারপর বাইরে এসে ছোট্ট লিসিপ্রিয়া সাংবাদিকদের বলে যে আমার থেকে ছোট ও আমার বয়সী শিশু সহ আমরা সবাই যাতে বিশুদ্ধ বায়ুতে শ্বাস নিতে পারি, বিশুদ্ধ পানীয় জল পান করতে পারি এবং বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার পৃথিবীতে বাঁচতে পারি, তার জন্যই আমার এই প্রতিবাদ। আমি চাই আন্তর্জাতিক নেতারা বিশ্ব জুড়ে ঘটে চলা যুদ্ধ বন্ধ করুক এবং পৃথিবীর জলবায়ু রক্ষার্থে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধ হোক। তার পোস্টারে লেখা ছিল ঃ 'এন্ড ফসিল ফুয়েল, সেভ আওয়ার প্ল্যানেট অ্যান্ড আরও ফিউচার'।

আসুন, লিসিপ্রিয়াদের মতো বিশ্বের সমস্ত শিশুকে দূষিত জলবায়ু ও এই দূষণের জন্য দায়ী মুনাফালোভী, যুদ্ধবাজ পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে রক্ষার জন্য লড়াইয়ে সামিল হই।

ডাঃ দীপক কুমার গিরি
বেলদা, পশ্চিম মেদিনীপুর

বিপিটিএ-র রাজ্য বার্ষিক সাধারণ সভা

কেন্দ্র, রাজ্য সরকারের শিক্ষা ধ্বংসকারী নীতির বিরুদ্ধে এবং স্বচ্ছ শিক্ষক নিয়োগ ও বকেয়া সহ কেন্দ্রীয় হারে ডিএ-র দাবিতে নদিয়ার কৃষ্ণনগরে ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর বিপিটিএ-র রাজ্য বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিন শতাধিক শিক্ষক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। বক্তব্য রাখেন অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ মিত্র, মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সদস্য দিলীপ মাইতি, অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি কমল কান্তি দত্ত, সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হান্ডা প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি মোসাব্বর হোসেন।

রাষ্ট্র ও বিপ্লব

তিনের পাতার পর

ধরনের শক্তি বা কর্তৃত্ব ছাড়া কাজ করতে পারবে না, এটা কি পরিষ্কার নয়?

'কট্টর' কর্তৃত্ব-বিরোধীদের কাছে যখন আমি এই যুক্তি তুলে ধরি, তখন একটা জবাবই তাঁরা দিতে পারেন— হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু যে ধরনের কর্তৃত্ব আমরা আমাদের প্রতিনিধিদের হাতে অর্পণ করি, এখানে সেই ধরনের কর্তৃত্বের প্রশ্ন উঠছে না। এখানে আমরা অন্যকে দায়িত্ব দিচ্ছি। এইসব ভদ্রলোকেরা মনে করেন, নাম পাল্টে দিলে, জিনিসটাই পাল্টে যায়।

এইভাবে এঙ্গেলস দেখালেন, কর্তৃত্ব ও স্বায়ত্বশাসন— এই দুটো হল আপেক্ষিক শব্দ। সমাজের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে এদের প্রয়োগের ক্ষেত্র পাল্টে যায়। এদের চরম বলে মনে করা একেবারেই ভুল। এঙ্গেলস আরও দেখালেন, যন্ত্র ও বৃহদায়তন উৎপাদনের প্রয়োগের ক্ষেত্র ক্রমাগত বিস্তৃত হচ্ছে। এর পর এঙ্গেলস কর্তৃত্ব সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা থেকে চলে গেলেন রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনায়। তিনি লিখেছেন,

"... যদি স্বায়ত্তশাসনবাদীরা এই কথার মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখত যে, ভবিষ্যতের সমাজ সংগঠন কর্তৃত্বকে তত দূর পর্যন্ত স্বীকার করবে, যত দূর পর্যন্ত উৎপাদনের শর্তগুলি তার সীমা নির্দিষ্ট করে দেবে, তা হলে তাদের সঙ্গে একটা বোঝাবুঝিতে আসা যেত। কিন্তু যে সব ঘটনা কর্তৃত্বকে আবশ্যক করে সেগুলি সম্পর্কে তারা অন্ধ এবং একবগ্গা ভাবে তারা এই শব্দটির বিরোধিতা করে।

"কর্তৃত্ব-বিরোধীরা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব তথা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখে না কেন? সমস্ত সমাজতন্ত্রীরা এই বিষয়ে একমত যে, আসন্ন সমাজবিপ্লবের ফলে রাষ্ট্র এবং তার সাথে রাজনৈতিক কর্তৃত্বও অবলুপ্ত হয়ে পড়বে। অর্থাৎ, সরকারি কাজকর্ম তার রাজনৈতিক চরিত্র হারাবে, তা পরিণত হবে সামাজিক স্বার্থের তত্ত্বাবধায়ক সাধারণ প্রশাসনিক কাজকর্মে। কিন্তু কর্তৃত্ব-বিরোধীরা দাবি করে, রাজনৈতিক রাষ্ট্রকে এক ধাক্কায় অবলুপ্ত করতে হবে, এমনকি তা করতে হবে যে-সব সামাজিক সম্পর্কগুলি এই রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে, সেই সম্পর্কগুলি লোপ পাওয়ার আগেই। তারা দাবি করেন, সামাজিক বিপ্লবের প্রথম কাজই হবে কর্তৃত্বের অবসান ঘটানো।

"এই সব ভদ্রমহোদয়েরা কি কখনও কোনও বিপ্লব দেখেছেন? সব কিছুর মধ্যে বিপ্লব অবশ্যই সবচেয়ে কর্তৃত্বমূলক বিষয়। এ এমন একটা কাজ, যেখানে সমাজের একটা অংশ রাইফেল, বেয়নেট ও কামানের সাহায্যে নিজেদের ইচ্ছা সমাজের অন্য অংশের উপর চাপিয়ে দেয়। এগুলি সবই প্রবল কর্তৃত্বকারী উপায়। এবং বিজয়ী দল প্রতিক্রিয়াশীলদের উপর তার আধিপত্য বজায় রাখে যে ভীতি সঞ্চারের মধ্যে দিয়ে, তা আসে তার অস্ত্রের শক্তির জোরে। প্যারিস কমিউন যদি বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে তার সশস্ত্র জনগণের কর্তৃত্ব প্রয়োগ না করত, তা কি একদিনও টিকে থাকত? বরং সে কর্তৃত্ব বড়ই কম ব্যবহার করেছে বলে আমরা তাকে দোষারোপ করি না কি? তাই, এই দুটোর মধ্যে একটা— হয় কর্তৃত্ব-বিরোধীরা জানেন না তাঁরা কী নিয়ে কথা বলছেন এবং এ ক্ষেত্রে তাঁরা শুধু বিভ্রান্তিই তৈরি করছেন। অথবা, তাঁরা সবই জানেন, এবং সেই ক্ষেত্রে তাঁরা সর্বহারা শ্রেণির স্বার্থের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। এই দুই ক্ষেত্রেই তারা প্রতিক্রিয়াশীলদের সেবা করছেন।" (পৃষ্ঠা ৩৯)

এই আলোচনা প্রসঙ্গে যে প্রশ্নগুলি উঠে এসেছে সেগুলির বিচার করতে হবে— রাষ্ট্রের বিলুপ্তির সময়ে (এই বিষয়টি পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা হবে) রাজনীতি এবং অর্থনীতির মধ্যে সম্পর্ক কী দাঁড়ায়, তার পরিপ্রেক্ষিতে। প্রশ্নগুলি হল ঃ সরকারি কাজের রাজনৈতিক প্রকৃতি লোপ পেয়ে সহজ সরল প্রশাসনিক কাজে রূপান্তর এবং "রাজনৈতিক রাষ্ট্র"। এই শেষ যে কথাটি বিভ্রান্তি তৈরি করে, তা রাষ্ট্রের অবলুপ্তিরই ইঙ্গিত দেয়, যে, এই প্রক্রিয়ার একটা নির্দিষ্ট স্তরে রাষ্ট্র যখন অবলুপ্ত হতে থাকবে, তখন তাকে অরাজনৈতিক রাষ্ট্র বলা যেতে পারে।

আবার, এঙ্গেলস নৈরাজ্যবাদীদের বিরোধিতার বিষয়টিকে যে ভাবে উত্থাপন করেছেন, সেটিই হল এই বিতর্কের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টতা। এঙ্গেলসের অনুগামী বলে দাবি করা সোসাল ডেমোক্র্যাটরা, ১৮৭৩ সালের পর থেকে নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে লক্ষ বার এই বিষয়ে যুক্তি উত্থাপন করেছেন, কিন্তু মার্ক্সবাদীরা যে ভাবে যুক্তি উত্থাপন করে, বা তাঁদের যেভাবে তা উত্থাপন করা উচিত, তা তাঁরা করেননি। রাষ্ট্রের অবলুপ্তি বিষয়ে নৈরাজ্যবাদী ধারণাকে এঙ্গেলস অবিপ্লবী ও তালগোল পাকানো বলেই বলেছেন। মোট কথা, বিপ্লবের অগ্রগতি ও বিকাশের ক্ষেত্রে হিংসা, কর্তৃত্ব, শক্তি, রাষ্ট্র ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট ভূমিকা কী, তা নৈরাজ্যবাদীরা দেখতে চায় না।

আধুনিক সোসাল ডেমোক্র্যাটরা নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনাকে নির্ভেজাল কূপমণ্ডুক গতানুগতিকতায় নামিয়ে এনেছে— "আমরা বাপু রাষ্ট্রকে স্বীকার করি, নৈরাজ্যবাদীরা করে না!" স্বাভাবিক ভাবেই এই ধরনের তুচ্ছ সমালোচনা, যাঁরা বিপ্লবী ও যাদের চিন্তা করার সামান্য ক্ষমতা আছে, সেই সব শ্রমিকদের দূরেই ঠেলে দেয়। এঙ্গেলস একেবারে আলাদা কথা বলেছেন। তিনি এই সত্যের উপর জোর দিয়েছেন যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে রাষ্ট্র অবলুপ্ত হবে, এ কথা সব সমাজতন্ত্রীই স্বীকার করে। তারপর তিনি সুনির্দিষ্টভাবে বিপ্লবের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন— সোসাল ডেমোক্র্যাটরা তাদের সুবিধাবাদী চরিত্রের জন্য এই বিপ্লবের প্রশ্নটি এড়িয়ে যান, পরিত্যাগ করেন, বলতে গেলে, এর সমাধানের বিষয়টিকে তাঁরা নৈরাজ্যবাদীদের জন্যই ছেড়ে রেখেছেন। এবং প্রশ্নটি নিয়ে এঙ্গেলস যখন আলোচনা করেছেন তখন একেবারে তার ঝুঁটি চেপে ধরেছেন। বলেছেন, কমিউনের কি রাষ্ট্রের বিপ্লবী শক্তিকে, শাসক শ্রেণি হিসাবে সংগঠিত সর্বহারার সশস্ত্র শক্তিকে, আরও জোরের সাথে ব্যবহার করা উচিত ছিল না?

বর্তমান দিনের নিয়মতান্ত্রিক সোসাল ডেমোক্রেসি বিপ্লবে সর্বহারা শ্রেণির সুনির্দিষ্ট দায়িত্বকে অবহেলায় উড়িয়ে দেয়। উড়িয়ে দেয় পণ্ডিত-মূর্খ তাচ্ছিল্যের সুরে, বা বড় জোর পরিশীলিত ঢঙে এড়িয়ে গিয়ে বলে ঃ "অপেক্ষা করে দেখাই যাক না"। ফলে এই প্রশ্নে নৈরাজ্যবাদীরা এই ধরনের সোসাল ডেমোক্রেসি সম্পর্কে এ কথা বলার সুযোগ পায় যে, ওরা শ্রমিকদের বিপ্লবী শিক্ষা দেওয়ার কর্তব্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে। রাষ্ট্র ও ব্যাঙ্ক সম্পর্কে সর্বহারা বিপ্লবের কী করা উচিত এবং কী ভাবে করা উচিত, মূলত এই সুনির্দিষ্ট কর্তব্য নির্ধারণের জন্য এঙ্গেলস সর্বশেষ সর্বহারা বিপ্লবের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন। (চলবে)

আসাম জুড়ে সূচনা হল শহিদ কনকলতা জন্মশতবর্ষ উদযাপন

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অমর শহিদ বীরাঙ্গনা কনকলতা বরুয়া। তাঁর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে প্রখ্যাত সাহিত্যিক নিরুপমা বরগোহাইকে সভাপতি এবং জিতেন চলিহা ও ময়ূখ ভট্টাচার্যকে যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত করে 'সারা আসাম শহিদ কনকলতা জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটি' গঠিত হয়েছে। ২২ ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে ২২ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে কনকলতার ভূমিকা, তাঁর চরিত্রের অনুকরণীয় দিকগুলি সমাজের সর্বস্তরে তুলে ধরার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

শহিদ কনকলতা বরুয়া জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে মিছিল

শহিদ কনকলতা ১৯২৪ সালের ২২ ডিসেম্বর দরং জেলার গহপুরের কাছে বরঙ্গাবাড়ি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪২ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে একজন সাধারণ স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দেন এবং ২০ সেপ্টেম্বর গহপুর থানায় স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলনে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করে পুলিশের গুলিতে শহিদের মৃত্যু বরণ করেন।

একজন সাধারণ নারী হিসাবে কনকলতার শিক্ষা-দীক্ষা, নাম, যশ, খ্যাতি, রাজনৈতিক কেরিয়ার এসব কিছুই ছিল না। কিন্তু মাত্র ১৭ বছর বয়সে অকৃত্রিম দেশপ্রেম, কর্তব্যনিষ্ঠা, অসীম নির্ভীকতা ও সর্বোপরি সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের দৃঢ়চিত্ততা দেখিয়ে তিনি নিজের অসাধারণত্ব প্রমাণ করেছিলেন। আজকের মতো সেদিনও ছিল আত্মবিক্রয়ের, আখের গুছিয়ে নেওয়ার সুবিধাবাদী রাজনীতি। ছিল বিরোধিতার নামে ব্রিটিশের তোষামোদ, ভীরুতা, কাপুরুষতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা। কিন্তু সেগুলোর কোনও কিছুই কনকলতাকে স্পর্শ করতে পারেনি। অন্যায়ের সঙ্গে আপস না করে তার প্রতিবাদের মধ্যেই যে মূল্যবোধ নিহিত থাকে, কঠিন সত্যকে গ্রহণ করতে না পারলে যে প্রকৃত মানব জীবন গড়ে উঠতে পারে না, আত্মবলিদানের মাধ্যমে এই মূল্যবোধগুলিই দেখিয়ে দিয়ে গেলেন কনকলতা।

শিশু বয়সে মাতৃহারা কনকলতা ঠাকুরদা ঘনকান্ত বরুয়ার তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন। প্রাথমিক স্কুল শিক্ষার পর সেই সময়ের প্রথা অনুযায়ী তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত হলেও ছোট বয়স থেকেই জানা, বোঝা ও সত্যানুসন্ধানের প্রতি তাঁর ছিল প্রবল আকাঙ্ক্ষা। বরঙ্গাবাড়ির বরুয়া পরিবারে তখন বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীর যাতায়াত ছিল, মামারাও ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। ঘরোয়া রাজনৈতিক পরিবেশেই কনকলতা দেশের জনসাধারণের পরাধীনতার দুঃখ-যন্ত্রণা অনুভব করতে পেরেছিলেন এবং নিজের অজান্তেই তাঁর মনের মধ্যে দেশপ্রেম এবং কর্তব্যবোধ জেগে উঠেছিল। মামা দেবেন বরার কাছ থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন ও ব্রিটিশের অন্যায় অত্যাচারের কাহিনী শুনে শুনে কনকলতার মনে ব্রিটিশ সম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণার জন্ম হয়েছিল। মামার হাত ধরেই কনকলতা যোগ দিয়েছিলেন বিভিন্ন ব্রিটিশ বিরোধী সভা-সমিতিতে এবং সেখানে জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার উদ্দীপনাময় দেশাত্ববোধক গান শুনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং সেই পথেই তাঁর দেশের জন্য কিছু করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মন-মানসিকতা গড়ে উঠেছিল।

দেশে তখন এক দিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আবহাওয়া এবং অন্যদিকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ বাহিনীর আপসহীন অভূতপূর্ব সংগ্রাম। এই পরিবেশে আপসহীন বিপ্লবীদের চাপে গান্ধীজিকে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দিতে হয়। আসামে এই আন্দোলনে স্ফুলিঙ্গের প্রকাশ ঘটে জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা মৃত্যুবাহিনীর মাধ্যমে। অনেক পুরুষের পাশাপাশি বহু মহিলাও এই মৃত্যুবাহিনীতে নাম নথিভুক্ত করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী জাগরণের ক্ষেত্রে আসামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন চন্দ্রপ্রভা শইকিয়ানী এবং পুষ্পলতা দাস। পুষ্পলতা দাসের পরিচালনায় বরঙ্গাবারী জারনিয়াল সত্রে মহিলাদের সভায় মৃত্যুবাহিনীতে নাম লেখানোর জন্য নাছোড়বান্দা হয়ে ওঠেন কনকলতা। বয়স ১৮ বছর না হওয়ার জন্য নেতৃত্ব তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করতে চাননি। তাঁর বারংবার অনুরোধে তাঁর নাম পরে অন্তর্ভুক্ত হয়। এভাবেই দৃঢ়তা, সাহস, প্রগাঢ় দেশপ্রেম ও মুক্তির আকুতির জন্যই তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ আত্মত্যাগের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সমর্থ হন।

১৯৪২ সনের ২০ সেপ্টেম্বর। গহপুর এবং ঢেকিয়াজুলিতে ব্রিটিশ থানায় স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলনকে ঘিরে বিপুল জনজাগরণের সৃষ্টি হয়। প্রায় সব নেতা আগেই গ্রেপ্তার হওয়ার ফলে যে শূন্যতা তৈরি হয় তা পূরণ করতে সেদিন জনগণ এগিয়ে এসে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বরঙ্গাবাড়ি থেকে গহপুর থানার দিকে হাজার হাজার জনতার দৃপ্ত মিছিলের সামনে তখন কনকলতা। চোখে-মুখে, চলার ভঙ্গিতে তাঁর প্রত্যয়ভরা বিশ্বাস, করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। থানার সামনে পুলিশের বিশাল বাহিনীর দুর্ভেদ্য বাধা উপেক্ষা করে পতাকা হতে নিয়ে এগিয়ে গেলেন কনকলতা। পুলিসের বন্দুকের নলের সামনে দাঁড়িয়ে দৃঢ়তার সাথে বললেন, 'অনুগ্রহ করে আমাদের রাস্তা ছেড়ে দিন, আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দেশের জনতার স্বার্থে আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করবই।' সাথে সাথে ভয়ঙ্কর শব্দে কেঁপে উঠল চারিদিক। ব্রিটিশ পুলিশের গুলি বক্ষ ভেদ করে নিরস্ত্র কনকলতার। পাশে থাকা মুকুন্দ কাকতি পতাকা তুলে ধরলে তিনিও শহিদের মৃত্যু বরণ করেন। গহপুরের রক্তসিক্ত মাটিতে রচিত হল স্বাধীনতা আন্দোলনের এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস।

শহিদ কনকলতা জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে গত ২২ ডিসেম্বর রাজ্যব্যাপী বর্ণাঢ্য কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে তাঁর জন্মশতবর্ষ উদযাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পালন করা হয়। গুয়াহাটিতে সুসজ্জিত শোভাযাত্রা উলুবারী ভলভো পয়েন্ট থেকে লক্ষ্মীরাম বরুয়া সদন পর্যন্ত পরিক্রমা করে। কমিটির তত্ত্বাবধানে একশো জন কিশোর-কিশোরী শহিদ কনকলতার ছবি সংবলিত পতাকা হাতে হাতে নিয়ে মার্চ করে।

লক্ষ্মীরাম বরুয়া সদনে এক গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানে কমিটির উপদেষ্টামণ্ডলীর প্রবীণ সদস্য তরেণ বড়ো পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। কমিটির উপ-সভাপতি ডাঃ চিত্রলেখা দাস এবং উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও জনতা শৃংখলাবদ্ধ ভাবে শহিদ কনকলতার প্রতিকৃতিতে মাল্যার্পণ করেন। একশোজনের কিশোরবাহিনী গার্ড অফ অনার জানায়। কমিটির যুগ্ম সম্পাদক জিতেন্দ্র চলিহার পরিচালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির উপ-সভাপতি সুভাষ গোস্বামী। সভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী তরেণ বড়ো, ডাঃ চিত্রলেখা দাস ও বিশিষ্ট নিবন্ধকার, লেখক শ্রী জিতেন শর্মা। আজকের এই চরম সামাজিক অবক্ষয়ের অন্ধকার সময়ে তরুণ প্রজন্ম যখন সমাজবিমুখ মানসিকতার শিকার, তখন শহিদ কনকলতা বরুয়ার জীবনসংগ্রাম চর্চা কীভাবে আলোকবর্তিকার কাজ করতে পারে, সে বিষয়ে আলোচনা করেন বক্তারা।

আসামের বরাক, ব্রহ্মপুত্র, উজান ও নিম্ন আসামের সর্বত্র শহিদ কনকলতা জন্মশতবর্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হয়েছে। শিলচর, হাইলাকান্দি, তেজপুর, যোরহাট ও গুয়াহাটিতে সুসজ্জিত মিছিল এবং আলোচনাসভা-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। তাছাড়া করিমগঞ্জ, নগাঁও, উত্তর লক্ষ্মীমপুর, গোয়ালপাড়া, ধুবরী, নলবারি, মঙ্গলদৈ, টংলা, বাইহাটা চারিআলী, তামুলপুরে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান, আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

সিপিডিআরএস-এর চতুর্থ রাজ্য সম্মেলন কোচবিহারে

মানবাধিকার সংগঠন 'কমিটি ফর প্রোটেকশন অফ ডেমোক্রেটিক রাইটস অ্যান্ড সেকুলারিজম'-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল কোচবিহার শহরে, ২৩-২৪ ডিসেম্বর। পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়া মাঠে প্রকাশ্য সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলার বিশিষ্ট অধ্যাপক অসিত কুমার চক্রবর্তী। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সহস্রাধিক মানবাধিকার কর্মী উপস্থিতি ছিলেন।

সংগঠনের সভাপতি, সিকিম হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মলয় সেনগুপ্ত সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বার্তা পাঠান। মানবাধিকার আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা সুজাত ভদ্র টেলিফোনে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন মানবাধিকার, বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষায় এই সংগঠনের প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আইনজীবী শিবেন্দ্রনাথ রায়। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অশোক গাঙ্গুলী টেলিফোনে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেন। গুজরাটে মানবাধিকার আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা দ্বারিকানাথ রথ তাঁর বক্তব্যে সারা দেশ, বিশেষ করে গুজরাটে চূড়ান্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের নিদর্শনগুলি তুলে ধরেন। সংগঠনের সহ-সভাপতি নভেন্দু পাল সম্প্রতি সংসদে পাশ হওয়া ভারতীয় দণ্ডবিধি সংক্রান্ত তিনটি অগণতান্ত্রিক বিল সহ দানবীয় আইনগুলির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান। বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক অধ্যাপক গৌরাঙ্গ দেবনাথ। চার শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সুকান্ত মঞ্চে প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন দ্বারিকারনাথ রথ ও সংগঠনের উপদেষ্টা সান্টু গুপ্ত।

সম্মেলন থেকে সিকিম হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মলয় সেনগুপ্তকে সভাপতি, অধ্যাপক সৌম্য সেনকে কার্যকরী সভাপতি, রাজকুমার বসাককে সম্পাদক, জ্ঞানতোষ প্রামাণিককে কোষাধ্যক্ষ, রাজীব সিকদারকে অফিস সম্পাদক, প্রদীপ দাসকে মুখপত্র সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত করে ১০৪ জনের রাজ্য কমিটি গঠন করা হয়।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

রাজ্যে রাজ্যে প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন এআইডিএসও-র

তীব্রতর করার আহ্বান জানিয়ে ২৮ ডিসেম্বর রাজ্যে রাজ্যে পালিত হল এআইডিএসও-র ৭০তম প্রতিষ্ঠা দিবস। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে রক্তপতাকা উত্তোলন করেন সর্বভারতীয় কমিটির সহ সভাপতি কমরেড মৃদুল সরকার। শহিদ বেদিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান কমরেড মৃদুল সরকার, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সামসুল আলম, চন্দন সাঁতরা এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায় সহ রাজ্য নেতৃবৃন্দ। এ দিন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের শিক্ষাবিরোধী নীতিগুলির প্রতিবাদে সর্বত্র মিছিল, আলোচনা সভা, সমাবেশ হয়। কলকাতায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত মিছিল হয়। কলেজ স্ট্রিটে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায়। শিলিগুড়ি শহরে মিছিল ও বাঘাযতীন পার্কে প্রকাশ্য সভা হয়। কোচবিহার, পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা, নদীয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলায় ও ক্যানিং সাংগঠনিক জেলায় প্রতিবাদ সভা, মিছিল, বুকস্টল হয়। দিল্লি সহ প্রায় সব রাজ্যেই প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচি পালিত হয়।

কলকাতা

দিল্লি

পশ্চিম মেদিনীপুর

কোচবিহার

প্রতাপগড়, উত্তরপ্রদেশ

চাইবাসা, ঝাড়খণ্ড

মহিলা ক্রীড়াবিদদের নিগ্রহকারী কর্মকর্তাদের শাস্তির দাবি তুললেন খেলোয়াড়রা

ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত মহিলা কুস্তিগিরদের প্রতি সংহতি জানিয়ে অন্য খেলোয়াড়দের খেলরত্ন ও অর্জুন পুরস্কার ফেরত প্রসঙ্গে ফোরাম ফর স্পোর্টস পারসনস অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি ডাঃ অশোক সামন্ত ও সম্পাদক অনিতা রায় ১ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

দেশের মুখ উজ্জ্বল করা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পদকজয়ী মহিলা কুস্তিগিররা যৌন হেনস্থার প্রতিবাদে জাতীয় কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতি ব্রিজভূষণ সহ তার ঘনিষ্ঠদের শাস্তি চেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। কিন্তু ন্যায়বিচার তাঁদের মেলেনি। অভিযুক্ত ব্রিজভূষণেরই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একজন সম্প্রতি এই সংস্থার প্রধান নির্বাচিত হওয়ায় সাক্ষী মালিক, বজরং পুনিয়া ও বিনেশ ফোগট একের পর এক তাঁদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারগুলি প্রধানমন্ত্রীকে ফিরিয়ে দিয়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

সংগঠনের পক্ষ থেকে ক্রীড়া জগতে নারী নিগ্রহের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং স্থায়ী সমাধানের জন্য ক্রীড়াবিদ সহ সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকদের কাছে ঐক্যবদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের আহ্বান জানানো হয়।

মিড-ডে মিল কর্মী সংগঠনগুলির যুক্ত কনভেনশন

সীমাহীন বঞ্চনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনে মিড-ডে মিল কর্মীদের পাঁচটি সংগঠনকে নিয়ে গড়ে উঠেছে মিড-ডে মিল কর্মী ঐক্যমঞ্চ। বেতন বৃদ্ধি, ১২ মাসের বেতন, ছাত্র-ছাত্রীদের খাবারের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবিতে এবং গ্রীষ্ম ও পুজোর ছুটিতে কাজ করিয়ে টাকা না দেওয়ার প্রতিবাদে আন্দোলনকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে যুক্ত কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় ২৯ ডিসেম্বর।

সংগঠনগুলি হল— সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়ন (এআইইউটিইউসি), পশ্চিমবঙ্গ মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়ন (সিআইটিইউ), পশ্চিমবঙ্গ সংগ্রামী রন্ধনকর্মী (মিড-ডে মিল) ইউনিয়ন (এআইসিসিটিইউ), অ্যাসোসিয়েশন অফ মিড ডে মিল অ্যাসিস্ট্যান্টস, পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজগারী ও রাধুঁনি ইউনিয়ন। কনভেনশনে আমন্ত্রিত হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক দিলীপ চক্রবর্তী, অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়, স্বাতী ভট্টাচার্য, সমাজকর্মী বিনায়ক সেন, কুমার রানা সহ বিশিষ্টজন।

মূল প্রস্তাব রাখেন এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক সুনন্দা পণ্ডা। এর উপর আলোচনা করেন সমস্ত সংগঠনের প্রতিনিধি এবং মিড-ডে মিল কর্মীরা। কর্মীদের দীর্ঘদিনের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে গড়ে ওঠা এই মঞ্চকে শক্তিশালী করে ঐক্যবদ্ধ বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তাঁরা।

মিড-ডে মিল কর্মীদের উপর সরকারি বঞ্চনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির সদস্যা মাহফুজা খাতুন। বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি সনাতন দাস।

এআইএমএসএস-এর পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন

অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন (এআইএমএসএস)-এর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার উত্তর সাংগঠনিক জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ৩০ ডিসেম্বর শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের বল্লুক হাইস্কুলে। এদিন সকালে নোনাকুড়ির বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশ থেকে মিছিল শুরু হয়ে সম্মেলন স্থলে পৌঁছায়। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদিতে মাল্যদানের পর শুরু হয় প্রতিনিধি সম্মেলন। সম্মেলনে নারী নির্যাতন বন্ধ, শিশু পাচার বন্ধ, বিজ্ঞাপনে অশ্লীল ছবি প্রদর্শনের প্রতিবাদ, খুন-ধর্ষণ বন্ধ সহ স্কিম ওয়ার্কারদের ন্যূনতম বেতন ও সম কাজে সম মজুরির দাবিতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সদস্যরা। মূল বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সহ-সভাপতি মাধবী প্রামাণিক। উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই (সি)-র পূর্ব মেদিনীপুর উত্তর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রণব মাইতি। সিক্তা মাজীকে সভাপতি, প্রতিমা জানাকে সম্পাদক, মায়া খামরইকে কোষাধ্যক্ষ করে ৮৫ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন তিন শতাধিক মহিলা।

মিড-ডে মিল কর্মীদের বিক্ষোভ কৃষ্ণনগরে

সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের ডাকে প্রতিবাদ সপ্তাহ পালনের কর্মসূচি হিসেবে ২৩ ডিসেম্বর কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতাল মোড়ে মিড-ডে মিল কর্মীদের পথ অবরোধ হয়। কর্মসূচিতে শতাধিক মিড-ডে মিল কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

অমিতাভ চ্যাটার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত
সম্পাদক অমিতাভ চ্যাটার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com